'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' : লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতিভাস

সোমা ভদ্র রায়

কল্লোলের কালের লেখক হলেও কল্লোলীয়দের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো প্রভেদ হলো, নগরকেন্দ্রিকতার একতরফা মোহ এবং প্রবণতার থেকে তিনি তাঁর চেতনাকে ফিরিয়ে এনেছেন বাংলার নিজস্ব গ্রাম্য জীবন এবং গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে। কল্লোলীয়দের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল শিকড়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ। তারাশঙ্কর শিকড়ের সন্ধানে তাঁর চেনা মাটির দেশের মানুষ নিয়ে কারবার করছেন। বীরভূমের যে লাভপুর গ্রামে তাঁর বেড়ে ওঠা, সেই পরিবেশ, প্রকৃতি ও সেখানকার মানুষের জীবনচর্চার কথা বারবার উঠে এসেছে তার কথা উপন্যাস। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উপকরণ সংগ্রহ করার ফলে তাঁকে দারিদ্র্য নিয়ে লোকদেখানো আস্ফালন করতে হয়নি। চেষ্টাকৃত লালসার অসংযম দেখানোরও প্রয়োজন হয়নি। মানুষের ভেতরকার আদিম প্রবৃত্তি জীবনের স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত বলিষ্ঠতায় তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়েউঠেছে। ভুলে গেলে চলবে না, নাগরিকতার আগ্রাসন থেকে আমাদের গ্রামজীবনও রেহাই পায়নি। কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কৌশলে বিধ্বস্ত হওয়ার সময় থেকেই গ্রামের মানুষের নাগরিক অভিমুখিতা দেখা দিয়েছিল। যতই সময় এগিয়েছে ততই নগর জীবনের নানা চোরাস্রোত, নানা ব্যাধির বীজ সংক্রমিত করেছে গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের আবহমান প্রবাহকে। লোকায়ত জীবনের আদিম সারল্যের সঙ্গে নাগরিক রক্তের মিশ্রণ ঘটে গেছে। এই মিশ্রণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আরও প্রবল হয়েছে, যেহেতু মানুষের বাণিজ্যিক অর্থস্পৃহা শহরের সীমানা ডিঙিয়ে জনপদের প্রত্যন্ত ভূমিতেও টান দিয়েছে। ক্রান্তিকালের মানুষ হিসেবে তারাশঙ্কর সময়ের এই স্বভাবকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে রাঢ় বাংলার জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিকতার সংযোগ লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ সমস্ত সময়ের সঙ্গে বংশগত মূলে তারাশঙ্কর জড়িত। চোখের উপর তিনি ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের চেহারা দেখেছেন। তার প্রতি মমতা অনুভব করেও ক্রমপ্রতাপশীল ধনতন্ত্রের বিস্তারের মধ্যে সামন্ত-সমাজের পরাজয় এবং অবক্ষয়ের অনিবার্যতাকে তিনি স্বীকার করতে পারেননি। নাগরিক জীবনের কথা তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অস্থির সংশয়ব্যাকুল কালের মধ্যে, পরিবর্তিত মূল্যবোধের মধ্যে অবস্থান করেও কোনো সদর্থক ভাবনা তাঁর মনের জমিকে তৈরি করেছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা মানুষের সমাজে চিরকালই সে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা সভ্যতার আলো জ্বালার আয়োজন করে পিলুসুজের তলায় অন্ধকারে পড়ে থাকে, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে যাদের লালন, সেই মানুষগুলোর কথা বারবার করে বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর আধুনিক জীবনভাবনার

অনায়াসেই একটা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এনে ফেলেছিলেন। আমাদের আলোচ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস তেমন ব্যাপ্তিতেই ধারণ করে আছে তথাকথিত নাগরিক জীবনের না-চেনা, না-জানা এক জনগোষ্ঠীর জীবনকথাকে।

লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকথাকে তার নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ এবং তাকে কাহিনিতে প্রকাশ খুব সহজ নয়। তারাশঙ্কর নিপুণ সহজতায় সেই কাজটি করেছেন এই উপন্যাসে। তিনি শুধু লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেননি লোকজীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজ-জীবন আখ্যানকে অপরিহার্যভাবে তুলে এনেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। কাহিনির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে কাহার জীবনের নানা বিষয়। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর এক প্রবল জীবনীশক্তি থাকে, তা দিয়েই প্রাণের সজীবতায় তারা লড়াই চালায়, টিকে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্যোগ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ অতিক্রম করেও জারি থাকে তাদের প্রাণ ধারণের প্রচেষ্টা। কাহার জনজাতির মধ্যে রয়েছে লৌকিক বিশ্বাস যা তাদের বেঁচে থাকার রসদ। তাদের জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের এই বোধ ও বিশ্বাস দ্বারা। জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত এই সংস্কার ও সংস্কৃতি।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি ভাবে আছে এক বাঁক, হাঁসুলীর গয়নার মতো তার চেহারা, তাই হাঁসুলী বাঁক। নামের মধ্যেই আছে কাহার মেয়েদের ব্যবহৃত গয়নার অনুষঙ্গ। বর্ষাকালে এ নদী দুর্নিবার। লেখকের বর্ণনার চমৎকারিত্ব লক্ষ করার মতো—

> কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়েঠ-হঠাত যেমন এক একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত করে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গায়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের ওপর যায় খসে, ছোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছঁড়ে মারে ইট-পাটকেল, পাথর, দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ঐ ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখ একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।

তারাশঙ্কর অপূর্ব অভিজ্ঞতায় চেনেন কাহার গোষ্ঠীর মানুষদের, চেনেন রাঢ়ের ধর্মবিশ্বাস, চেনেন রাঢ়মাটির প্রকৃতির বিচিত্র রূপে—তাই নদী ও নারীকে এক করে দেন অনায়াসে। নদীর রূপকে উঠে আসে কাহার নারীর কথা। নদীর মতোই তাদের চলন, পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণায় বাধা যায় না তাকে।

কাহিনির প্রারম্ভে আছে জঙ্গল থেকে শিসের শব্দ শোনা যাওয়ার প্রসঙ্গ। এই শিস কার, কে দিচ্ছে, দেবতা না যক্ষ না রক্ষ বুঝতে না পেরে কাহাররা ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মনে হয় ব্রহ্মদিত্যতলার কর্তাবাবা কোনো কারণে রুষ্ট হয়েছে। তারা ঘরে ঘরে কুলঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সা জমায়, 'লুতুন' পুনো দেবে বলে। তাদের জীবন কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তাই মজলিস বসে, শিসের কারণ খুঁজতে গিয়ে তাদের পানুর ঘুঁতো পাঁঠার কথা মনে পড়ে। এই পাঁঠা চৌধুরী এবার 'বেহ্মদত্তিতলায়'কত্তার পুজোয় উচ্ছুগো (উৎসর্গ) করেছে। কাজেই সেই পাপে এমন হতে পারে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশ বনে ঘেরা আলো আঁধারি গ্রাম কাহারদের বাঁশবেদে। এই গ্রামে আছে সুচাঁদ বুড়ি। তার বয়সের যেন কোনো গাছ পাথর নেই। তার মুখে লেগে নানা কাহিনি, পুরাকথা, গল্প। মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের নামের মধ্যে আছে উপকথা। সুচাঁদের বলে যাওয়া এসব মিথ কাহারদের জীবনেরই

অঙ্গ। প্রাচীন কিংবদন্তী এবং তার সঙ্গে বিজড়িত নানা আখ্যান সুচাঁদের মুখে মুখে ফেরে। তার লিখিত কোনো বয়ান নেই, সেসব তাদের দরকারও নেই। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের ধারক ও বাহক। এসব প্রচলিত কিংবদন্তী স্থির বিশ্বাসে ধারণ করে রেখেছে তাদের সমাজ। তাদের সংস্কৃতির এই অনিবার্য দীপশিখাটি কাহার সমাজের মানুষ অপার আস্থায় প্রজ্বলিত করে রাখে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কাহিনি বয়ে চলেছে, যা কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের কাছে সব দেবতার লীলা। দেবতার রোষে তাদের ভীতি। তাই বিশ্বাসের সবটুকু দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতে তারা। বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়েও কাহারদের জীবন যেন অতীতের দিকেই ঝুঁকে থাকে। প্রথাগত ঐতিহ্যের প্রতি তাদের নিবিড় আনুগত্য। সেটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায় বনওয়ারী ও কাহার সম্প্রদায়।

সুচাঁদ বুড়িই আবিষ্কার করে করালীর মারা সাপ আসলে কর্তাবাবার বাহন। সে চিৎকার করে পুরো কাহার পাড়াকে জানিয়ে দেয়—"অরে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে!অরি মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে তেমন করেন, আমি সে নিজের চোখে দেখেছি রে, দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমুল গাছের কোটরে সুখে নিদ্যে যাচ্ছিলেন রে"... এসব শুনে নারীপুরুষ সকলেই শিউরে ওঠে, প্রতিবিধান করার জন্য বাবাঠাকুরের পুজোর আয়োজন শুরু হয়। তারাশংকর খুব ভালো করেই জানেন হিন্দু উচ্চবর্ণের দেবতার পাশাপাশি কাহারদের লৌকিক দেবতার অবস্থান। তাদের বিশ্বাস মতে পুজোর উপাচার সাজানো হয়। লেখক বর্ণনা করেন লৌকিক দেবপুজোর—

> বাবাঠাকুরের তলায় ভোরবেলায় ঝুঁকিঝুকি থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকি ভোরের বাজনা ধুমুল বাজতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা-ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পুজো হবে। ফুলে-বেলপাতায়, তেলে-সিঁদুরে, ধূপে-প্রদীপে, আতপে-চিনিতে, দুধে-রম্ভায় অর্থাৎ কলার, মদে-মাসে, কাপড়ে দক্ষিণায় সমারোহ করে পূজো।

বাঁশবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা কুসংস্কারের গল্প, লৌকিক বিশ্বাসের কাহিনি। কখনও তারা দেবতার উদ্দেশ্যে গানও গায়। ঢোল বাজিয়ে সুর করে গান গাওয়া হয়, তার মধ্যে আছে মনসার ভাসান, ধর্মরাজের বোলান, ভাদ্রমাসে ভাদু-ভাজোর গান। বহির্বিশ্বের কোন খবরে তাদের দরকার কি! লৌকিক জীবনপ্রবাহ বয়ে যায় তাদের সংস্কারবিশ্বাস নিয়ে। তবু ধানের দাম বাড়ে, চাল অমিল হয় বাজারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝাপট এসে কিছুটা হলেও ধাক্কা দেয় তাদের। খুব বেশি আলোড়িত না হলেও তারা যুদ্ধ নিয়ে গান বানায়—"সাহেব লোকের লেগেছে লড়াই/ষাড়ের লড়াই মরে উলখাগড়াই-/ও হায়, মরিব মোরাই উলখাগোড়াই।" এছাড়া অজস্র ঘেঁটু গান, ভাদু গানের কথা আছে এই উপন্যাসে। লোকসংগীত লোকজীবনেরই অঙ্গ। লোকসংস্কৃতির পরিচয়বাহী এই গান নানা পরবে তাদের উদযাপিত জীবনের প্রকাশ—"তাই ঘুণাঘুণ-বাজে নাগরী/ননদিনীর শাসনের-চরণের নুপূর থামিতে চায় না/ঘরে থাকিতে মনো চায় না, ও তাই তাই ঘুণাঘুণ।"—এমন অসংখ্য গান এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লোকংস্কৃতির পরিচয়কে গাঢ় করেছে। আর আছে পাল্কীর গান। বাংলার লোকসংগীত আসলে কখনও কখনও কর্মসঙ্গীত। পাল্কী বহন করার কষ্ট লাঘব করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে পাল্কীর গান। তারপরে তা মিশে গেছে তাদের জীবনের সঙ্গে। বনওয়ারীর সঙ্গে আছে

পাগল কাহার—তারা আদ্যিকালের গান গাইতে থাকে। সুর করে—

—জোর পায়ে চলিব—

—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ

—আরও জোর কদমে

—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ

—বরেরো পাল্কী, প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ! পড়িল পিছনে—

—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ।

—আগে চলে লক্ষ্মী—

—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ

—পিছে-এস নারায়ণ

এভাবেই লোকসংস্কৃতি উঠে এসেছে এই গল্পের কথনে। উপাদান হিসেবে নয়, পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। এর সঙ্গে অঙ্গীভূত লোকবিশ্বাস, নানা কুসংস্কার। এসব নিয়েই বেঁচে আছে কাহাররা। তাদের সংস্কারের সঙ্গে মিশে আছে নানা লোকপুরাণ কথা। যার ধারক ও বাহক হলো সুচাঁদ, আর বনওয়ারী। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের সমাজকে এই বিশবাস্কে টিকিয়ে রাখার। নানা বর্ণ দিয়ে লেখক এঁকেছেন সে ছবি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> এই সমাজের সমগ্র চিত্র শুধু যে বাস্তব নিখুঁত ফটোগ্রাফ তাহা নহে, ইহার ওপরে সঞ্চরমান দইবশক্তি, প্রতিটি কর্মের পিছনে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা, চিত্তের নিগূঢ় ক্রিয়াশীল ভাবকপনা ও ঐতিহ্যপ্রভাব এবং ইহার মধ্যে প্রবাহিত একটি প্রাণবৈদ্যুতিনপূর্ণ জীবনানন্দলীলা-মনোলোকের এই সমস্ত নিগূঢ় পরিচয় এই উপন্যাসে স্বচ্ছ সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে।[১]

লেখক এক বৃহত্তর কয়ানভাসে ধরেছেন কাহার জনগোষ্ঠীর জীবনকথাকে। তাদের মনজগতের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-হতাশা, প্রেম-অপ্রেম, ভূত-পেত্নী, দৈত্যদানোর অস্তিত্বকে তারা ভয় পায় এবং তা অলীক বলে ভাবে না। নিশি আছে যা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। এভাবেই আঁকা হয়ে যায় কর্তাবাবার ছবি। সুচাঁদের মুখ নিঃসৃত বাণীতেয় বাবার প্রতিমূর্তি যেন কাহারদের সামনে ভেসে ওঠে। পরনে গেরুয়া কাপড়, পায়ে খড়ম, হাতে দণ্ড, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝলমলিয়ে ন্যাড়া মাথায় বাবা রাত্রে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় বলেই কাহারদের বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এমন অসংখ্য প্রবাদ প্রবচন তারা কথার মাঝে ব্যবহার করে। সেগুলি অনতিদীর্ঘ এবং অর্থবহ—'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারোমাস।' যদিও চন্দনপুরের ভদ্রলোকের কাছে এসবই কাহারদের রচনা করা গাল-গল্প। তবে দ্বন্দ্ব শুধু বাইরে নয়, অন্দরেও আছে—প্রাচীন আর নবীনের, লোকবিশ্বাস আর অবিশ্বাসে, লোকজীবন ও আধুনিক জীবন, কাহার জীবন আর রেলের কুলি মজুরের। সুচাঁদ ও বনওয়ারী তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, মিথ এসব নিয়েই বেঁচে আছে। কিন্তু করালীর মতো নবীন কাহার তা মানতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব অনিবার্য। আর তাতে লেখকের মমত্ব লোকজীবনের প্রতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি, লোকবিশ্বাসের প্রতি, প্রাচীনের প্রতি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য—

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা করালী বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব কাহিনীতে-সর্বত্র নূতন যন্ত্রযুগ বা ইংরাজী শিক্ষার অপ্রতিহত প্রভাব ও শক্তির পটভূমিতে পুরনো শিক্ষাদীক্ষা-বিশ্বাস সম্পন্ন মানুষের পরাজয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন লেখক।[২]

রাঢ়ের জল মাটিতে বেড়ে ওঠা তারাশঙ্কর তাঁর দেখা-জানা-চেনা লোকজীবন কথাকে নিয়ে এলেন তার রক্তমাংস সমেত। তাকে শিল্পকাঠামোতে দাঁড় করাতে গিয়ে কিছু আপোষ করলেন না। নির্দ্বিধায় নতুন পথ খুঁজে নিলেন কাহিনি কথনের। আলোচক যথার্থই বলেছেন—

এখানে (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা) তারাশঙ্করের উপন্যাস নতুন মোড় নিয়েছ। আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক রূপ এখানে দেখি। তার চেয়ে বড় কথা এখানে লেখক হয়ে উঠেছেন কালের রূপকার ক্রনিক্লার। মানুষ, সজীব প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে।[৩]

বাঁশবাদির কাহারদের চেতনায় বয়ে চলেছে মিথ বা লোকপুরাণের ধারা। বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেও মোটামুটিভাবে মিথোলজির মনোজগতেই তারা বাস করে। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে সুচাঁদ সেই প্রত্ন ইতিহাসের মঙ্কে ধরে রেখেছে সবচেয়ে নিবিড় করে। ব্যতিক্রম করালী ও তার সাকরেদরা। হাঁসুলীর বাঁকে সে নতুন যুগের ধ্যানধারণার প্রথম দিশারী। লেখক লোকায়ত জীবন সংস্কৃতির নিপুণ ছবি এঁকেছেন গভীর বাস্তবতায়। সময়ের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেননি তিনি। তাই কালারুদ্রের মিথের পাশাপাশি উঠে এসছে করালীর পাকাঘর বানানোর বৃত্তান্ত। কাহার গোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাসের সঙ্গে এসে গেল করালীর চন্দনপুরের রেলকারখানায় চাকরি বিষয়টিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল প্রকোপ যে এই কাহার জীবনে আঘাত হয়ে নেমে আসছে তাও জানাতে ভোলেন না লেখক। তাই তাদের 'বাবার থান' হয়ে যায় বারুদ রাখার গুদাম। তারাশঙ্কর এখানেই সার্থক। কাহারদের জীবনের সত্যগুলিকের নিপুণ চিত্রকরের মতো তুলে ধরার সাথে সাথে দিয়ে যায় সময়ের আমোঘ বার্তা। লোকসংস্কৃতি নিখুঁত ছবি গূঢ় সত্যনিষ্ঠায় ধারণ করে আছে এই উপন্যাস। লেখক এক মহাজীবনের ভাষ্যকার। তাঁর নিবিড় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সৃজনপ্রতিভা মিশে সৃষ্টি হয়েছে এই অপরূপ উপকথা। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। লোকসংস্কৃতির বৃত্তান্তের সঙ্গে কালের নিয়মে তার অনিবার্য বিবর্তনের রূপটি এ আখ্যানে জুড়ে দিয়ে লেখক উপন্যাসটিকে এক বিচিত্র মাত্রাদান করেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা.লি., কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬, পৃ ৫৫৮

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', অভী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃ. ৩৭২

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ৩৬